বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ পদ্ধতি

মাছ চাষের ধরন

আমাদের দেশের জলাশয়গুলোতে প্রধানত একক ও মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে মাছের চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এ দুধরনের চাষ পদ্ধতি ছাড়াও বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কিছু মাছ চাষ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন- খাঁচায় মাছ চাষ, পেনে মাছ চাষ ও সমন্বিত মাছ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ সব বিশেষ পদ্ধতির মাছ চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এগুলোর সমপ্রসারণ খুবই সীমিত। নীচে মাছ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো-

একক চাষ

কোন জলাশয়ে যখন শুধুমাত্র এক প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি চাষ করা হয় তখন এ ধরনের চাষ পদ্ধতিকে একক চাষ বলে। যেমন- একটা পুকুরে শুধুমাত্র তেলাপিয়া বা গলদা চিংড়ি বা মাগুর বা থাই পাংগাসের চাষ সাধারণতঃ বাণিজ্যিকভাবে নিবিড় ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাবারের উপর খুব একটা নির্ভর করা হয় না এবং সম্পূরক খাবার প্রয়োগে উচ্চ বাজার মূল্য সম্পন্ন মাছের চাষ করা হয়। তবে আমাদের দেশে মৌসুমী পুকুরে সাধারণ ব্যবস্থাপনায়ও এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে।

চিত্র- সরপুটির একক চাষ

মিশ্র চাষ

কোন জলাশয়ে যখন একাধিক প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি একত্রে চাষ করা হয় তখন এ ধরনের মাছ চাষকে মিশ্র চাষ বলে। জলাশয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের সুষ্ঠ ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রজাতি একত্রে ছাড়া হয় এক্ষেত্রে মাছগুলো সাধারণতঃ বিভিন্ন খাদ্যাভাসের হয়ে থাকে। সাধারণ ব্যবস্থাপনায় একক চাষের চেয়ে মিশ্র চাষে বেশী উৎপাদন পাওয়া যায়। যেমন- সিলভার কার্প, কাতলা, রুই, মৃগেল, কমন কার্প, গ্রাসকার্প এবং থাই সরপুটি ইত্যাদি প্রজাতির একত্রে চাষ।

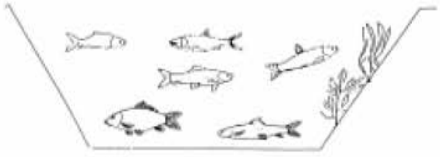

চিত্র- রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ

খাঁচায় মাছ চাষ

খাঁচায় মাছ চাষ বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে একটি নতুন প্রযুক্তি। কিন্তু এশিয়ার বেশ কিছু দেশ যেমন- ইন্দোনেশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও নেপালে খাঁচায় মাছ চাষের প্রচলন বেশ প্রাচীন। খাল, বিল, নদী-নালা, প্লাবনভূমিসহ যে কোন ধরনেরমুক্ত জলাশয়ে স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন সব সুলভ উপকরণ দ্বারা তৈরীকৃত খাঁচায়মাছ চাষ করা যায়। খাঁচায় সাধারণত মাছের একক চাষ করা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু প্রজাতির মিশ্রচাষও করা যেতে পারে। যদিও এ ধরনের মাছ চাষ সম্পূর্ণরূপে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল বা স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়এমন খাদ্য ব্যবহার করেই লাভজনকভাবে খাঁচায় মাছ চাষ করা যায়। খাঁচায় মাছ চাষে খুব বেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না বিধায় আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে উন্মুক্ত জলাশয়ে এ ধরনের মাছ চাষের ভবিষ্যত খুবই সম্ভাবনাময়।

চিত্র- খাঁচায় মাছ চাষ

পেনে মাছ চাষ

উন্মুক্ত জলাশয়ের এক বা একাধিক দিক বাঁশের বানা, বেড়া বা জাল দিয়ে ঘিরে উক্ত ঘেরের মধ্যে মাছ মজুদ করে চাষ করার ব্যবস্থাই হচ্ছে পেন বা ঘেরে মাছ চাষ। এ ধরনের মাছ চাষের বৈশিষ্ট্য হলো পেনের বানা বা ঘের জলাশয়ের মাটিতে প্রোথিত থাকে এবং পেনের পানির সাথে বাইরের পানির সংযোগ বা প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। পেনে মাছ চাষ পদ্ধতি খুব বেশী দিনের পুরনো নয় গত শতকের তৃতীয় দশকে প্রথমে জাপান, পরে চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তির বিস্তার ঘটে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের জন্য

ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া এ প্রযুক্তি বহুলভাবে ব্যবহার করছে। বাংলাদেশেও পেনে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পুকুর বা অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ের মত পেনেও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মিশ্রচাষ অধিক লাভজনক। তবে মাছের উৎপাদন ও লাভের বিষয়টি নির্ভর করে সঠিক প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব, বাঁচার হার ও চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদী-কেন্দ্র, চাঁদপুর ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে সেচ খালে পরীক্ষামূলকভাবে রুই জাতীয় মাছের চাষ করে হেক্টর প্রতি বৎসরে যথাক্রমে ২.৯৬ ও ৫.৪ টন উৎপাদন পেয়েছেন।

সমন্বিত মাছ চাষ

সমন্বিত মাছ চাষ হচ্ছে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রেখে সবোর্চ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য একই জলাশয়ে একই সময়ে একাধিক ফসলের চাষ। যেমন- ধানক্ষেতে মাছ চাষ, হাঁস/মুরগি ও মাছের একত্রে চাষ, মাছ ও সব্জি চাষ, মাছ ও গবাদি পশুর চাষ ইত্যাদি।

সমন্বিত চাষের অর্থ হলো হাঁস মুরগী ও পশুপালন, শাকসব্জি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন ইত্যাদি কৃষি কাজের সাথে মাছ চাষের **সমন্বয়** ঘটানো। এতে মাছ চাষে উপকরণ বাবদ খরচ কম হয় এবং মাছের পাশাপাশি এক বা একাধিক বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। সামপ্রতিককালে **সমন্বিত** মাছ চাষের ধারণাটি বেশী আলোচিত হলেও বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনেক আগে থেকেই কমবেশী এ ধরনের চাষের ঐতিহ্য রয়েছে । আমাদের দেশের কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য **সমন্বিত** চাষ ব্যবস্থাপনাকে আরও দ্রুত জনপ্রিয় ও সমপ্রসারিত করা প্রয়োজন।

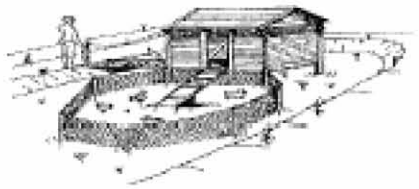

চিত্র- মাছ ও হাঁসের সমন্বিত চাষ

মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মাছের বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও কার্যক্রমের যথার্থ ব্যবহার যা দ্বারা সর্বাধিক সহনশীল পর্যায়ে মাছ উৎপাদন সম্ভব। উৎপাদনের মৌলিক উপাদান যেমন- মাটি, পানি, উপকরণ, পুঁজি ও শ্রমের **সমন্বয়ের** মাধ্যমে লাভজনক উৎপাদনই ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। এ সব উপাদানের বিভিন্ন ধরনের **সমন্বয়ের** কারণে মাছ চাষে প্রধানত চার ধরনের ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। নীচে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

ব্যাপক চাষ ব্যবস্থাপনা

এ ধরনের চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রায় বিনা খরচে বা অল্প খরচে মাছ চাষ করা হয়। শুধুমাত্র পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হয়। পুকুরে কোন সার বা সম্পূরক খাবার দেয়া হয় না, সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক খাবারের ওপর নির্ভর করা হয় । তা ছাড়াও এ ধরনের মাছ চাষে অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহন বা মাছ চাষের কারিগরি বিষয় বিবেচনা করা হয় না। এর ফলে পুকুরে শতাংশ প্রতি বছেও ১ - ২ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাছ চাষের ধারাবাহিক পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ না করেই পুকুরে হিসেব ছাড়া মাছের পোনা ছেড়ে অনিয়মিতভাবে আহরণ করা।

উন্নত ব্যাপক চাষ ব্যবস্থাপনা

সামান্য উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা যেখানে পুকুরের আগাছা ও রাক্ষুসে মাছ দূর করে তুলনামূলক কম ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হয়। অনিয়মিত সার ও খাদ্য প্রয়োগ ছাড়াও পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষের অন্যান্য কাজগুলো অনিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হয়ে থাকে । বর্তমানে আমাদের দেশে এ ধরনের চাষ ব্যবস্থাপনাই অধিক প্রচলিত এবং এর ফলে শতাংশ প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন উৎপাদন ৫ - ১২ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আধা নিবিড় পদ্ধতি

জলাশয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, মধ্যম মজুদ ঘনত্ব, নিয়মিত সার ও হাতে তৈরী খাদ্য প্রয়োগ, পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পর থেকে আংশিক মাছ ধরা ও পুনঃমজুদ এবং প্রয়োজনে পানি বদল ও বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মাছ চাষের কিছু আধুনিক কলা কৌশল মেনে চলা হয়। এ ব্যবস্থাপনায় মাছের বার্ষিক উৎপাদন শতাংশ প্রতি ১৫ - ৩০ কেজি বা তারও অধিক হতে পারে।

নিবিড় পদ্ধতি

ব্যয় বহুল অবকাঠামোগত সংস্কারের পর অতি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছ চাষই হলো নিবিড় পদ্ধতি। ব্যবহার্য উপাদানসমূহ ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। অধিক বিনিয়োগ ও শ্রমের প্রয়োজন। অধিক মুনাফা তবে ঝুঁকি বেশী এবং পরিবেশের উপর প্রতিকুল প্রভাব ফেলে থাকে।

চাষযোগ্য মাছের মৌলিক জীব বিজ্ঞান

বাংলাদেশের **স্বাদু** পানিতে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি বাস করে। এ ছাড়াও বর্তমানে আরও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্ত মাছ ও চিংড়ির সবগুলোই পুকুরে লাভজনকভাবে চাষাবাদযোগ্য নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সমস্ত প্রজাতি

- **পুকুরের** প্রাকৃতিক খাদ্যের যথার্থ ব্যবহারে সক্ষম
- **স্বল্প** মূল্যের ও সহজলভ্য সম্পূরক খাদ্য খায়
- **খাদ্য** শিকল ছোট এবং দ্রুত বর্ধনশীল
- **রাক্ষুসে স্বভাবের** নয়
- **এলাকাগত** চাহিদা ও বাজার দর ভাল

কেবলমাত্র সেগুলোর চাষ করেই পুকুর থেকে সর্বাধিক উৎপাদন ও লাভ পাওয়া যেতে পারে। উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে লাভজনকভাবে চাষযোগ্য কার্প, পাংগাস ও চিংড়ির প্রজাতিগুলো হচ্ছে-

দেশী কার্প:

- **কাতলা**
- **রুই**
- **মৃগেল**

বিদেশী কার্প:

- **সিলভার**
- **গ্রাসকার্প**
- **কমন** কার্প (কার্পিও, মিরর কার্প)
- **সরপুটি**

পাংগাস: থাই পাংগাস

চিংড়ি: গলদা চিংড়ি

রুই

আবাসস্থল

খাল, বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড় ও পুকুরের পানির মধ্যস্তরে বাস করে।

খাদ্যাভাস

রুই মাছ সাধারণভাবে পানির মধ্যস্তরে বিচরণ করে এবং সেখানে বিদ্যমান খাদ্য উপাদান ভক্ষণ করে থাকে। তবে পানির উপর এবং নীচের স্তরেও রুইয়ের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। জুপ্লাংক্টন, পঁচা জৈব পদার্থ ও ছোট কীট প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে।

দৈহিক বৃদ্ধি

পরিবেশ ও চাষ ব্যবস্থাপনার উপর দৈহিক বৃদ্ধি নির্ভর করে। পুকুর-দীঘিতে রুই মাছ ১ বছরে ১.২৫ কেজি এবং ২ বছরে ২-৩ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রজনন

২ বছর বয়সে রুই পরিপূর্ণভাবে প্রজননক্ষম হয় এবং মে-জুলাই মাসে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন ঘটায়। অপেক্ষাকৃত কম গভীর এবং স্রোতশীল পানিতে এরা ডিম ছাড়ে। বদ্ধ জলাশয়ে রুই মাছের প্রজনন ঘটে না। তবে হ্যাচারীতে ব্যাপকভাবে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করা হয়। একটি প্রজনন উপযোগী রুই মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৩ লক্ষাধিক পর্যন্ত হয়ে থাকে।

কাতলা

আবাসস্থল

কাতলা বিশেষভাবে **স্রোতস্বিনী** নদ-নদীর মাছ। তবে খাল, বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দীঘিসহ মিঠা পানির যে কোন জলাশয়ে বাস করতে পারে। এমন কি অল্প লবনাক্ত পানিতেও কাতলা খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

খাদ্যাভাস

কাতলা সাধারণভাবে পানির উপর স্তরে বিচরণ করে। এরা প্রধানত জুপ্লাংক্টন ভোজী। তবে পুকুরের পরিবেশ থেকে শেওলা, ছোট কীট, উদ্ভিদের খন্ডাংশ, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদিও খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে থাকে।

দৈহিক বৃদ্ধি

কাতলা মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। দৈর্ঘ্যে এরা সর্বাধিক ৬ ফুট এবং ওজনে ৪৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। পর্যাপ্ত খাবার পেলে কাতলা ১ বছরে ২-৩ কেজি এবং ২ বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে।

প্রজনন

প্রাকৃতিক পরিবেশে ২ বছর বয়সেই কাতলা পরিপক্ক হয়। তবে বাংলাদেশের পরিবেশে পুকুরে চাষকৃত মাছ ৪ বছরের আগে পরিপক্ক প্রজননক্ষম হয় না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ মাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না, মে-জুলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম পাড়ে। সেখান থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে চাষ করা যায়। বর্তমানে হ্যাচারীতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ রেণু উৎপাদন করা হয়ে থাকে। প্রজনন উপযোগী বয়সে কাতলা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৪-৫ লক্ষ্য পর্যন্ত হতে পারে।

মৃগেল

আবাসস্থল

রুই, কাতলার মত মৃগেল মাছ মিঠা পানির যে কোন জলাশয়ে বাস করতে পারে। বর্ষাকালে ধান ক্ষেতে এ মাছ খুব বেশী দেখা যায়। এরা পানির নীচের স্তরে বিচরণ করে।

খাদ্যাভাস

মৃগেল মাছ জলাশয়ের তলদেশের কর্দমাক্ত স্তর থেকে খাদ্য গ্রহন করে। জুপ্লাংক্টন , তলার ছোট/বড় কীট পতঙ্গ, পচা জৈব পদার্থ, কাদা, বালি ইত্যাদি মৃগেলের প্রিয় খাদ্য।

দৈহিক বৃদ্ধি

মৃগেল মাছ রুই, কাতলার তুলনায় কম বর্ধনশীল। ১ বছরে এ মাছ ৬০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত বড় হতে পারে। পরিণত মাছ **লম্বায়** ৩ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্রজনন

মৃগেল মাছ ১ বছর বয়সেই পরিপক্ক হয়। কারও কারও মতে এ মাছ ৬ মাসেই পরিপক্ক হয়ে থাকে। একই বয়সের পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আগে পরিপক্কতা অর্জন করে। পরিণত বয়সে ১ কেজি ওজনের একটি মৃগেল ১ লক্ষ ডিম ধারণ করতে পারে। এ মাছও বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না, মে-জুলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম দেয়। তবে হ্যাচারীতে এপ্রিল মাস থেকেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করতে দেখা যায়।

গ্রাস কার্প

আবাসস্থল

পুকুর, খাল-বিলের সকল স্তরে বিচরণ করে। তবে এরা জলাশয়ের পাড় ঘেরে চলাচল করতে পছন্দ করে।

খাদ্যাভাস

গ্রাস কার্প প্রধানত তৃণভোজী **স্বভাবের।** পোনা অবস্থায় এরা জুপ্লাংক্টন ও মশার লার্ভা খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যাভাস পরিবর্তিত হয় এবং পুকুরের পরিবেশ থেকে ঝাঁঝি, হাইড্রিলা, স্পাইরোডেলা ক্ষুদি পানা, কুটি পানা, নরম ঘাস ইত্যাদি খেতে শুরু করে। বাইরে থেকে সরবরাহকৃত কলার পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, শীতকালীন শাকসব্জি খেতেও এরা বেশ পছন্দ করে। গ্রাস কার্প দৈনিক এর

দেহ ওজনের প্রায় ৪০-৫০% উদ্ভিদ জাতীয় খাবার গ্রহন করতে পারে। এমন কি অন্যান্য রুই জাতীয় মাছের মত খৈল, কুড়া, ফিসমিল জাতীয় সম্পূরক খাদ্যও খেয়ে থাকে।

দৈহিক বৃদ্ধি

বিদেশী মাছের মধ্যে গ্রাসকার্পের দৈহিক বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশী। নিয়মিত খাবার দিলে চাষের প্রথম বছরে এ মাছ ৩-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। পরিণত অবস্থায় এরা দৈর্ঘ্যে ১.৫ মিটার এবং ওজনে ৩০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রজনন

পুরুষ ও স্ত্রী মাছ যথাক্রমে ২ ও ৩ বছরে পরিপক্কতা অর্জন করে। পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়ে এদের পরিপক্কতা আসে কিন্তু প্রজনন করে না। পিটুইটারী হরমোন ও এইচসিজি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে মে-আগষ্ট মাস পর্যন্ত এদের প্রজনন করানো হয়। একটি পরিপক্ক গ্রাসকার্প প্রায় ১লক্ষ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে।

সিলভার কার্প

আবাসস্থল

এরা নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুরের পানির উপরের স্তরে বিচরণ করে।

খাদ্যাভাস

অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা সাধারণত জুপ্লাংক্টন খেতে অভ্যস্ত। পোনার আকার কিছুটা বড় হলে এরা ফাইটো-প্লাংক্টন খেয়ে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে এবং বাকী জীবন প্রধানত ফাইটোপ্লাংক্টন খেতে খুবই পছন্দ করে।

দৈহিক বৃদ্ধি

সিলভার কার্পের দৈহিক বৃদ্ধির হার খুব বেশী। দেখা গেছে পুকুরে চাষ করলে এ মাছ ১ বছরে ১.৫ কেজি এবং ২ বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রজনন

সিলভার কার্প ২ বছরের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়। এ বয়সের একটি মাছ সর্বাধিক ৮ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন করা হয়। মার্চের শেষ দিকে এদের প্রজনন মৌসুম শুরু হয়।

কার্পিও

আবাস স্থল

হাওড়-বাওড় ও পুকুরের পানির নীচের স্তরে বাস করে।

খাদ্যাভাস

পুকুরের তলদেশ থেকে এ মাছ খাদ্য গ্রহন করে। খাদ্যের জন্য এরা পুকুরের তলদেশ, পাড় ও চারপাশের মাটি খামচে আলগা করে। রেণু অবস্থায় এরা জুপ্লাংক্টন ভক্ষণ করে। পরিণত বয়সে প্লাংক্টন, ছোট/বড় কীট, ছোট শামুক, কেঁচো, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে।

দৈহিক বৃদ্ধি

এটিও একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে এ মাছ বছরে ১-৩ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে।

প্রজনন

৫-৬ মাসেই এ মাছ প্রজননক্ষম হয়। এরা বদ্ধ জলাশয়ে প্রাকৃতিক প্রজননে অভ্যস্ত এবং বছরে ২বার (জানুয়ারী- মার্চ ও জুলাই- আগষ্ট) প্রজনন করে । কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারীতেও এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

সরপুটি

আবাসস্থল

নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুরের পানির সকল স্তরে এরা বিচরণ করে।

খাদ্যাভাস

রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শেওলা ও ছোট জুপ্লাংক্টন খায়। পরিণত অবস্থায় এরা উদ্ভিদভোজী। উদ্ভিদ হিসেবে ক্ষুদি পানা, সুজি পানা, হাইড্রিলা, নরম ঘাস, পেঁপে পাতা, আলু পাতা, বাঁধা কপি ইত্যাদি এদেও খুবই প্রিয় খাদ্য।

দৈহিক বৃদ্ধি

মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল। ৩-৬ মাসের মধ্যে এরা খাওয়ার উপযোগী (১০০-২০০ গ্রাম) হয়। অনুকূল পরিবেশে থাইল্যান্ডে এ মাছ সর্বাধিক ৩-৩.৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে তবে বাংলাদেশে ১.০-১.৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে দেখা গেছে।

প্রজনন

সরপুটি ১ বছরেই প্রজননক্ষম হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে এরা প্রজনন করে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন করা হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় যেমন-হ্যাচারী সংলগ্ন পুকুরে যদি পানির প্রবাহ থাকে কিংবা বৃষ্টির পানি যদি পুকুরে গড়িয়ে ঢোকার সুযোগ থাকে তাহলেপুকুরেও প্রজনন করতে সক্ষম।

পাংগাস

আবাসস্থল

নদী ও পুকুরের তলদেশে বাস করে।

খাদ্যাভাস

পাংগাস মাছ সর্বভূক। জলাশয়ের পরিবেশ থেকে এরা ফাইটোপ্লাংক্টন, জুপ্লাংক্টন, তলদেশের পোকা মাকড়, কেঁচো, ছোট শামুক, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে। পুকুরে চাষকালে খাদ্য হিসেবে খৈল, কুড়া, ভুষি, ফিসমিল, পশুর রক্ত ও নাড়িভুড়ি ইত্যাদি খেতে খুবই পছন্দ করে।

দৈহিক বৃদ্ধি

পরিমিত খাদ্য প্রয়োগে চাষ করলে পুকুরে এরা প্রথম বছরে ১ কেজির উপরে বড় হয় এবং ২ বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। পরিণত বয়সে এরা ১৫০ সেমি **লম্বা** ও ওজনে ১০-১৫ কেজি পর্যন্ত বড় হতে পারে। সাধারণভাবে পুরুষ মাছ আকারে স্ত্রী মাছের চেয়ে ছোট হয়।

প্রজনন

পাংগাস মাছ বছরে ৩-৪ বার প্রজনন করতে পারে কিন্তু সাধারণত পুকুরে এরা ডিম ছাড়ে না। পুকুরে এরা যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন করা হয়।